দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০/১১/২০০০

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৬...

প্রতিবছর নতুন বই প্রকাশের নামে একটি চক্র মুনাফা লুটছে

জিম্মি করছে ছাত্র অভিভাবকদের

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পাঠ্যপুস্তক ঘিরে থাকা পাঁচটি মহলের একটি শক্তিশালী চক্র প্রতিবছরই নতুন বই প্রকাশের নামে অভিভাবক ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হয়রানি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই চক্রের দুর্নীতি ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট সৃষ্টি করছে অন্যদিকে পুরনো বই পড়ে আর্থিক সাশ্রয়ের সুযোগটুকু বন্ধ করে দিয়েছে। ফি বছর টুকটাক সংশোধন ও সংযোজন করে নতুন বই প্রকাশ ও পুরনো বই বাতিলের নেপথ্যে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেশের সিংহভাগ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের কষ্টার্জিত অর্থ এবং সরকার ও দাতা সংস্থার অনুদানের একটি অংশ নিয়মিত লুফে নেবার উপায় হিসাবে প্রতিবছরই নতুন বই প্রকাশ করা হচ্ছে। যে কারণে অন্তত প্রতি পাঁচ বছরে সংশোধিত ও সংযোজিত হয়ে নতুন বই প্রকাশের যে রেওয়াজ তা নামিয়ে আনা হয়েছে এক বছরে। স্পর্শকাতর বই হয়ে উঠেছে স্বার্থসিদ্ধি ও মুনাফা লাভের হাতিয়ার।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বছর বছর যে কাণ্ড ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা 'নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ' ছাড়া কিছুই নয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমেদ বলেছেন, সময়োপযোগী করতে বই পরিবর্তন করা উচিত তবে তা অন্তত পাঁচ বছরের মাথায়। আর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান শফিউর রহমান স্বীকার করলেন যে, প্রতিবছরই বই পাল্টানো উচিত নয়। আর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বললেন, সামান্য সংশোধন করে নতুন মোড়কে প্রতিবছর বই প্রকাশের

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

প্রতিবছর নতুন বই

(১২-এর পাতার পর)

সঙ্গে কোন মহলের স্থায়ী যোগসূত্র থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষার মান উন্নয়ন বা জাতীয় স্বার্থে বছর বছর বই পরিবর্তন করা হচ্ছে না। কোনরকম মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই নামকাওয়াস্তে খুঁটিনাটি পরিবর্তন এনে নতুন বই প্রকাশের ফলে উপকৃত হচ্ছে পাঁচটি মহল। বেসরকারী এক হিসাব মতে, প্রতিবছর নতুন বই প্রকাশ, বিনামূল্যে বিতরণ ও বাজারজাত প্রক্রিয়ায় এসব মহল হাতিয়ে নিচ্ছে অন্তত দশ কোটি টাকা। আর এর সিংহভাগই যোগান দেন অসহায় অভিভাবকরা। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, এই সরকার সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছে। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে কারও যোগসাজশ থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। তিনি মনে করেন যে, মেজর চেঞ্জ না হলে বই রি-প্রিন্ট হতেই পারে তবে রি-ইউজ হতে বাধা থাকার কথা নয়।'

যুগ যুগ ধরে দেশে প্রচলিত রেওয়াজ ছিল পুরনো বই ব্যবহার করে সন্তানের পিছনে অভিভাবকের যে শিক্ষাব্যয় তার কিছুটা লাঘব করা। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা এই পথ অবলম্বন করতেন। পিঠাপিঠি সন্তান থাকা পরিবারে বড় ভাই বা বোনের কনিষ্ঠজন পুরনো বই পড়ত। তাছাড়া পাড়া বা মহল্লায় উঁচু ক্লাসে পড়া শিক্ষার্থীকে নিচু ক্লাসে পড়া শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক বুকিং দিয়ে রাখতেন। অঘোষিত নিয়ম ছিল অর্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ দামে পুরনো বই বিক্রি করা। বুকিং দেবার সময় কেবল শর্ত থাকত বইগুলো যেন যত্নের সঙ্গে রাখা হয়। পুরনো বই পুনর্ব্যবহার হওয়ায় অভিভাবকের আর্থিক সাশ্রয় হতো। কিন্তু গত এক দশক ধরে ফি বছর নতুন বই প্রকাশ এবং পুরনো বই বাতিল করায় এই সুযোগ আর নেই। প্রত্যেক সন্তানের জন্য অভিভাবককে কিনতে হয় নতুন বই। ফলে এক বছর পড়ার পর কোন বই-ই আর কাজে লাগে না। পুনর্ব্যবহারের বদলে হাজার টাকা দিয়ে কেনা বইয়ের সেট বিক্রি করা হয় কেজি দরে।

এদিকে বড় ধরনের কোন মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই প্রতিবছর নামকাওয়াস্তে নতুন বই প্রকাশ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কিছু বিতর্কিত বিষয়, দু'একটি বানান এবং যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারের পৃষ্ঠপোষকদের কিছু লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে পাঠ্যবইয়ে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তেমন কোন বিষয় নতুন পাঠ্যবইয়ে থাকছে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেন, পাঠ্যবইয়ে কি ধরনের পরিবর্তন হয় তার একজন সাক্ষী তিনি। একজন সচিব ইচ্ছা করলেন যে, কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সারা দেশে তাই করা হলো। তিনি সচিবকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজধানীর একটি স্কুলের শিক্ষার্থী কৃষি শিক্ষা পড়ে কতটুকু উপকৃত হবে? এমনকি একজন কৃষকের ছেলেও শ্রেণীকক্ষে কৃষি শিক্ষা পড়ে কৃষিকাজের কতটুকু শিখবে? জবাবে সচিব বললেন, বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের একটি ফান্ড পেতে তাদের বোঝানো দরকার যে বাংলাদেশ কৃষি শিক্ষাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক মমতাজ উদদীন বললেন, ধূমপানবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বলে ধূমপানের কুফল নিয়ে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির লেখা প্রবন্ধ পাঠ্যবইয়ে ঢোকানো হয়েছে।

পাঠ্যবই প্রকাশের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পাঁচটি মহল। এরা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, লেখক, প্রকাশক ও ব্যবসায়ী। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনিয়ম ও দুর্নীতি ওপেন সিক্রেট। প্রকাশকদের রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। মুনাফার পাল্লা ভারি করাটাই তাদের কাজ। একটু এদিক সেদিক হলেই তারা সৃষ্টি করেন হৈচৈ। প্রকাশকদের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর রয়েছে যোগসূত্র। দুর্নীতির কারণে প্রতিবছরই বোর্ডের বইয়ের দরপত্রে নির্ধারিত রেটের মারাত্মক ওঠানামা করে। '৯৭ সালে মুদ্রণ সমিতিসমূহের ব্যানারে জোটবদ্ধ প্রকাশক গ্রুপ প্রতিহাজার ফর্মা ৭২ টাকা দরে কার্যাদেশ আদায় করে নেয়। '৯৮ সালে জোটবদ্ধ সমিতিসমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিহাজার ফর্মা ৩৮ টাকা দরে কাজ করে। '৯৯ সালে মুদ্রণ সমিতিসমূহ ভুল বুঝতে পেরে আবার ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রতি হাজার ফর্মা ৯০ টাকা দর দাবি করে। চরম দরকষাকষির পর প্রকাশকরা প্রতিহাজার ফর্মা ৫৫ টাকা দরে কাজ করে। ২০০০ সালে প্রকাশকরা দাম হাঁকে প্রতিহাজার ফর্মা ৮১ টাকা। পাশাপাশি নতুন প্রতিষ্ঠান পুস্তকা ৫৪ টাকা দরে কাজ করার অফার দেয়। জোটবদ্ধ সমিতিসমূহ রেট থেকে সরে না আসার কারণে ৫৪ টাকা দরেই পুস্তকা ও সমিতিবহির্ভূত কয়েকটি ছোট প্রতিষ্ঠান কাজ পায়। সমিতিকে পাশ কাটিয়ে চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়ে সরকার বেকায়দায় পড়ে এবং বই কেলেঙ্কারির কবলে পড়ে।

এদিকে পুস্তক প্রকাশে এই মুনাফা লাভের ইঁদুরদৌড় চলার পাশাপাশি বইয়ের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও চলছে বিস্ময়কর কাণ্ড। সামান্য টুকটাক সংশোধন করেই বইয়ের দাম প্রতি বছরই বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনকি